মরে মরে বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য মরণপণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি চা-বাগিচায়

ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের যাবতীয় জুলুমবাজির মোকাবিলা করে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে আরও এক কদম এগিয়ে নিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকরা। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের ২৭৬টি 'সেট বাগান' ও আরও কয়েক শো 'নয়া বাগান'-এর কয়েক লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন ১২-১৩ জুন। চা-শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর প্রতি সংহতি জানাতে সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা এবং কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ও উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার সাধারণ মানুষ।

অত্যন্ত লাভজনক শিল্প হওয়া সত্ত্বেও চা-শিল্পের শ্রমিকরা নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়ে আসছেন এই শিল্পের পত্তনের সময় থেকেই। অর্থাৎ দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে। আবাদি বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে, লাভ বাড়ছে। বেড়েই চলেছে। অথচ শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তলানিতে এসে ঠেকেছে। তিন বছর পর পর এক ন্যক্করজনক ও নীতিহীন দরকষাকষির মধ্য দিয়ে কয়েক টাকা মজুরি বাড়ে, যার কোনও যৌক্তিক ভিত্তি তো নেই-ই বরং যা অত্যন্ত অন্যায় ও প্রতরণামূলক। দেশের আইন, সর্বোচ্চ ত্রিপাক্ষিক সংস্থা (ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স)-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী আট ঘণ্টা পরিশ্রমের বিনিময়ে কমপক্ষে চা শ্রমিকদের যে প্রাপ্য তা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হয়ে আসছেন। স্বাধীন দেশের কোনও সরকারই এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলিও এই প্রশ্নে নীরব ভূমিকা পালন করে এসেছে। এ আই ইউ টি ইউ সি গত দুই দশক ধরে একক প্রচেষ্টায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে গেছে। ২০১৪ সালে গড়ে ওঠে ইউনিয়নগুলির যুক্ত মঞ্চ—জয়েন্ট ফোরাম। লাগাতার আন্দোলনের চাপে ২০১৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার ও মালিকপক্ষ ন্যূনতম মজুরির দাবি মেনে নেয়। সেই শর্তেই একটা অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দু'বছরের মধ্যে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ ও ঘোষণার লিখিত অঙ্গীকার সত্ত্বেও সরকার ও মালিকরা আজ সেখান থেকে সরে এসে আবার পুরনো কায়দায় কয়েক টাকা মজুরি বৃদ্ধির একটা চুক্তি শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই শ্রমিকরা আবার আন্দোলনের ময়দানে। তাঁরা বুঝে নিতে চান তাঁদের রক্ত-ঘামের হিসেব। এটা নিছক মজুরি বৃদ্ধির লড়াই নয়, এটা তাঁদের মর্যাদার প্রশ্ন, ইজ্জতের প্রশ্ন।

কয়েকমাস ধরে লাগাতার মিছিল-মিটিং চলার পর এই ধর্মঘট। মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় ধর্মঘটকে বানচাল করতে নেমে পড়ে সরকারি দল ও প্রশাসন। বেআইনি সার্কুলার জারি থেকে শুরু করে নানা কায়দায় ভয়ভীতি প্রদর্শন চলতে থাকে। ধর্মঘট ভাঙতে ভাড়াটে বাহিনীর সাথে সামিল হয় পুলিশ, র‍্যাফ। বাগানে বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের কাজে পাঠানো এবং কারখানার গেট খোলার চেষ্টা, ধর-পাকড়, লাঠিচার্জ সবই চলে। ক্ষমতাসীন দলের আশ্রিত গুন্ডারা পুলিশের সামনেই তাণ্ডব চালায়।

কয়েকশো শ্রমিক মার খায়, হাজতে যায় কিন্তু সংকল্পে অটল থেকে সফল করে তোলে ধর্মঘটকে। দার্জিলিং পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষও একই রকম জুলুমবাজির মোকাবিলা করে। বিশেষ করে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার গোশালা মোড়ে পুলিশি তাণ্ডব চরম আকার ধারণ করে। গুরুতরভাবে আহত হন বহু মানুষ। কিন্তু লড়াকু চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো, বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা থেকেই সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। ১৪ জুন পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে থানায় থানায় বিক্ষোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষক, আইনজীবী থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ।

শ্রমিকরা অঙ্গীকার করেছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। আরও বড় ধরনের কর্মসূচি নিয়ে তাঁরা নামবেন। একদিন কাজে না গেলে ঘরের বাচ্চা না খেয়ে থাকে। কিন্তু তাঁরা ঠিক করেছেন মরে মরে বাঁচার চাইতে বাঁচার জন্য মরতেও তাঁরা পিছুপা হবেন না।